সাক্ষাৎকার
সমকালীন বারো কবি

শিহাব শাহরিয়ার

সাক্ষাৎকার : সমকালীন বারো কবি
শিহাব শাহরিয়ার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৮০ টাকা

Conversations with Twelve Contemporary Poets by Shihab Shahriar Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Published: October 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 280 Taka RS: 280 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-5-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কবি ও শিল্পী
জামাল হোসেন

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

কাব্যগ্রন্থ

হাওয়ায় রাত ভাসে ভাসে নিদ্রা (২০০৩), ফড়িঙের পাখা পোড়ে (২০০৬), নদীর তলপেট ফুঁড়ে উড়ে যায় রোদ (২০১০), আমি দেখি অন্য আকাশ: নির্বাচিত কবিতা (২০১১), যখন ভাঙে নক্ষত্র (২০১৩), মাতাল মেঘের ওড়াউড়ি (২০১৪), খড়ের খোয়াড় (২০১৫), কথোপকথন: দূরে ওড়ে শঙ্খচিল (২০১৭), প্রেমের কবিতা (২০১৭), রাত পৌনে চারটা (২০১৮), পড়ে থাকে অহংকার (২০১৯), অদৃশ্যগুচ্ছ (২০২০), কবিতা সংগ্রহ (২০২১), স্বনির্বাচিত কবিতা (২০২২), নিঃসঙ্গ নদীছায়া (২০২২), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০২৩) ও উড়েছ দূরের বসন্তে (২০২৩)।

গবেষণাগ্রন্থ

বাংলাদেশের পুতুলনাচ (১৯৯৭), বাংলাদেশে হাজং জনগোষ্ঠী (২০০৮), বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমেলা শেরপুর (২০১৪), বাংলাদেশের কোচ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি (২০১৫), পুনর্মুদ্রণ (২০২২)

ভ্রমণগ্রন্থ

মেঘের আলোয় (২০১৬), ভ্রমণসমগ্র (২০২২)

প্রবন্ধগ্রন্থ

নরম রোদের আলোয় (২০০৫)

গল্পগ্রন্থ

ঘাটে নদী নেই (২০১২)

স্মৃতিগ্রন্থ

স্মৃতিসুধা ধরা থাক (২০১৯)

সম্পাদনাগ্রন্থ

আমার বাংলাদেশ (২০১০), রূপকথার এই বাংলাদেশ (২০১৪) ও বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর দেশপ্রেমের কবিতা (২০২১)।

সম্পাদক

বৈঠা : লোকনন্দন বিষয়ক পত্রিকা
প্রকাশিত সংখ্যা : জ্যোৎস্না (২০০৫), বৃষ্টি (২০০৭), গ্রাম (২০১৩)

কবিরাই সৃজন-ঈশ্বর

ঘরের অন্ধ চৌকাঠে গাঙচিলের পাখার মতো গোপন শব্দে মেতে ওঠে মনোবেদনার অন্তর্জাল। জাল-জানালার অনুরণনে জেগে ওঠে শুয়ে থাকা পাশের ঘাসগুলো। কবিরা ভাবেন, কবিতা কি ঘাস? কবি কেন প্রতিদিন ঘাসের ঘটনা বলেন? কবি কেন ওর শরীরে ভরে দেন শব্দের পর শব্দ? উপমারা কি সুঘ্রাণ ছড়ায়? উপমারা কি ভাঙে কুমারীর শরীর? অথবা নদীঘাটে জলের ঘূর্ণন নেই? অথবা সামুদ্রিক পাখিরা দ্বীপভূমির কুয়াশায় উড়েছিল একদিন? অথবা শাখা নদীর চোখ থেকে কালো পাখার পানকৌড়িরা হারিয়ে গেছে বালিকাবেলায়? অথবা ঘুঘুরা ঠোঁটে ঠোঁটে ভেঙেছিল দুপুরের ঘুম? অথবা টিনঘরের ফ্রেম থেকে সাতপুরুষের ছবি হারিয়েছিল একদিন? কবিতা কি আত্মার ঘ্রাণ? আত্মা কি জেগে ওঠে? জন্মগ্রামের পিঠ-পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দেয় সরিষার ডানা? অথবা ব্রহ্মপুত্রের জল-আয়নায় কেউ কেউ দেখে চুল-চিরুনির চেহারা। আর কবিরা পেছন ফিরে দেখেন, বিকেলের শেষাংশ বিলিন হয়ে গেছে ঢালুর খোড়লে। খোড়লে হাত রেখে কবি হারিয়ে যান নিঃসীম অন্ধকারে। এই নিঃসীমের সীমানা যেন কংক্রিটের জানালা। জানালায় বৃষ্টির ঘুঙুর নেই। জ্যোৎস্নারা অভিমানে আড়াল করে জানালার ছাদ। নক্ষত্রেরা এক এক করে ভেঙে দেয় জানালার আঙুল। পেছনের পথ দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ। কবিতা ধুলো-ওড়ানো পথ, কবিতা ঘাসফড়িং, আলো-হাওয়া নদীজীবন। কখনো ঘাসফড়িঙের গায়ে ভাঙে নক্ষত্র, কখন ভাঙে? কীভাবে ভাঙে? ভাঙে কি? যেমন জ্যোৎস্না ভাঙে চাঁদ, স্রোত ভাঙে ঢেউ, নদী ভাঙে ঘাট, পাখি ভাঙে ঠোঁট, আঁধার ভাঙে রাত, দুপুর ভাঙে রোদ, স্বপ্ন ভাঙে ঘুম, কুমারী ভাঙে শরীর, জানালা ভাঙে ভোর, নারী ভাঙে মন। একদিন হাওরের জলে ভাসতে ভাসতে কবি ভাবেন : 'আমি এইসব শব্দ আর উপমা কোথায় পাই, কীভাবে পাই, কেন পাই? আমি জানি না? জানি, শুধু শব্দ আর উপমারা আমার নিরস, ক্লান্ত, অবসন্ন ও ক্লেদাক্ত মনকে কেবল জাগায় না, অজানা আনন্দে ভরে দেয়। আনন্দগুলো কন্যাসন্তানের মতো, বাবার গলা জড়িয়ে ধরে সকালের উঠোনকে তাজা রোদ ছড়িয়ে দেয়। এখানেও লুকিয়ে আছে অসংখ্য কিউট কন্যারা, যারা এই অদৃশ্যগুচ্ছের বাসিন্দা। যারা মুখরিত করে কবিতা। আমি, এইসব নান্দনিক শব্দ, উপমা ও বাক্যের কারুকাজে একটি সুন্দর কবিতা হয়ে উঠতে দেখি'।

কবি হলেন ঈশ্বর? সৃজনক্ষেত্রে কবির চেয়ে বড় ঈশ্বর নেই; কারণ কবিতা হলো সাহিত্যের সবচেয়ে উঁচু মাধ্যম। কবি সারাক্ষণ ধ্যান ও জ্ঞান দিয়ে যে নির্মাণটি করেন, তা পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ফসল। তারপরও কবিকে রুটির রোজগার করতে হয়? শুধু ধ্যান ও জ্ঞান নিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। আবার রুটির রোজগার করতে গিয়েও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন অমর পঙ্‌ক্তিমালা। সুতরাং আর্থিকভাবে কবি যেমনই হোন, সৃজনক্ষেত্রে কবির তুলনা আরেকজন কবি। একটি ভালো কবিতা সৃজনের উন্মাদনায় তিনি ব্যাকুল থাকেন, সারা জীবন কাটিয়ে দেন। যদি লিখতে পারেন তাহলে ওই একটি কবিতার মাধ্যমেই তিনি ঈশ্বর বনে যান। যেমন টি এস এলিয়েটের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতাটি। আবার একজন কবি সারা জীবন অসংখ্য কবিতা লেখেন, কবিতা লেখাই যেন তাঁর ধর্ম। আবার কেউ কেউ জনপ্রিয় হওয়ার জন্যও কবিতা লেখেন। অবশ্য পূর্ব থেকে কেউ বলতে পারেন না, তিনি জনপ্রিয় হবেন? দ্বিমত তো আছেই, অনেক মেধাবী কবি কখনো জনপ্রিয়তার ধার ধারেন না? এটিই বোধহয় ঠিক। কারণ ঈশ্বর কি কখনো জনপ্রিয়তা কামনা করেন? না। তবে কোনো কবির কোনো কবিতা পাঠকের পরিতৃপ্তি পায়, তাহলে ভাগ্যে বর।

কবিদের জীবন কেমন? কবিরা কি সংসারী হন না সংসার-বৈরাগী হন? যখন সৃজনক্ষেত্রেই থাকবেন, তখন কতটা তারা স্বপ্নে থাকবেন, জাগরণে থাকবেন, কী খাবেন, কোথায় বসে খাবেন? ডাইনিং টেবিলে না হাইওয়ের পাশে টঙের দোকানে? কখন গোসল করবেন? কতক্ষণ ঘুমাবেন? বিয়ে করবেন না করবেন না? ছেলেমেয়েদের প্রতি তাদের নজর কতটুকু? যৌনক্রিয়ায় তারা আগ্রহী কি না? আকাশের বজ্রমেঘে তারা কম্পিত হন কি না? নদীভ্রমণের সময় তারা ঘূর্ণন দেখেন কি না? তারা কি পাকা রাস্তা না কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে ভালোবাসেন? ভ্রমণে তারা কতটা উৎসাহী? মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই বা তারা কতটা অভিজ্ঞ? আসলে তারা কবিতার উদ্‌যাপন করেন কি না কিংবা সংসারী জীবন প্রকারান্তরে চান? ইত্যকার বিষয়গুলো জানবার আগ্রহও থাকে অনেক পাঠকের বা সমাজের অনেক মানুষের। সে কারণে কবিদের সাক্ষাৎকার হয়ে ওঠে মূল্যবান ইনটেলকচুয়াল পোপার্টি বা সাহিত্য-সম্পদ। দৃষ্টিকোণ সেখানে রেখেই বাংলাদেশের সমকালীন বারোজন কবির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার উদ্যোগ নিই। কবিরা হলেন : শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, শহীদ কাদরী, সিকদার আমিনুল হক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কামাল চৌধুরী এবং সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল।

২.

সমকালীন বাংলাদেশের কবি ও কবিতা বলতে আমরা কী বুঝি বা এর শুরু বা পরিধি কোথায়? হতে পারে উনিশশ সাতচল্লিশে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া

বাংলাদেশের লেখক-কবিরা কলকাতা থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এঁদের সবার নাম না আনলেও কবিদের মধ্যে দুজনের নাম বলা যায়—আহসান হাবীব, আবুল হোসেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই বাংলাদেশের কবিতা বা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার মূল সূতিকাগার ১৯৪৮ সাল হয়ে ১৯৫২ সাল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালিদের সকল অভিযাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে যাঁরা লিখতে আসলেন, তাঁদের হাতে নির্মাণ হতে থাকল বাংলাদেশের কবিতা। একদিকে ভাষা আন্দোলন-উত্তর নতুন জোয়ার, যা ভাষা আন্দোলনের কবিতার বেগ পাশাপাশি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিকে প্রবল অভিযাত্রা। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য আন্দোলনের যুগোপদ যাত্রা বাংলাদেশ নির্মাণকে তরান্বিত করেছে। কবিরা এরই মধ্যে তিরিশোত্তর কবিদের কাব্যযাত্রার ধারায় থেকেও নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণে সফল হয়ে নিজেদেরকে বাংলা কবিতায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলেন। এরপর এলো মহান মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত যুদ্ধ যেমন তাঁদের কবিতায় স্থান পেল, তেমনি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, স্বদেশের মুখ, প্রকৃতি, প্রেম, পাওয়া না-পাওয়ার সুখ-বেদনায় আপ্লুত কবিরা তাঁদের কবিতায় তুলে আনলেন উল্লিখিত বিষয়-আশয়। বিজয় ও স্বাধীনতার মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই অন্যদের ন্যায় কবিরাও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের শট খেলেন, মর্মাহত হলেন, অবাক ও বিস্ময়বোধ করলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডে। তাঁরা আগস্টের শোকগাথা নিয়ে কবিতায় সোচ্চার হলেন। এই যে পরিসর—এই পরিসরেরই উল্লিখিত বারোজন কবি। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে শক্তিমান। এঁরা সবাই কবিতাকে আলোকিত করেছেন, করছেন। সবাই সমাজ, মানুষ, মানবতা নিয়ে লিখেছেন, লিখছেন কিন্তু একমাত্র আল মাহমুদ ছাড়া! জীবনের পড়ন্ত সময়ে এসে নিজেকে স্বৈরাচার ও মৌলবাদীদের কাছে বিক্রি করে বিকৃত হয়ে গেছেন। যিনি 'সোনালি কাবিন', 'কালের কলস' কিংবা 'পানকৌড়ি'র মতো লেখা, যিনি ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসধারণ পঙ্‌ক্তিমালা লিখেছেন। কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়ায় শক্তিশালী এই কবি মানবতা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। বাকিরা আমাদের বাংলা কবিতার দিকপাল। তাঁদের কবিতা নিয়ে কথা বলার এখানে দরকার নেই।

এঁদের প্রত্যেকের আমি সঙ্গ পেয়েছি, স্নেহছায়া পেয়েছি এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তারও আগে তাঁদের কবিতা পাঠে মুগ্ধ হয়েছি। সবার সব কবিতা হয়তো ভালো লাগেনি, কিন্তু আপনাদের মতো আমি এঁদের কবিতায় মনোযোগী থেকেছি। নিজে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। জীবনানন্দ দাশকে মান্য করেই এঁদের কবিতাকেও মান্য করেছি। এঁদের সঙ্গে দেখা করেছি, দেখা হয়েছে, কথা শুনেছি, বক্তব্য শুনেছি। শহর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তাঁদের আবাসস্থলে গিয়েছি। তারপর একদিন ভাবলাম, এঁদের সঙ্গে দীর্ঘ-আলাপে এঁদের কথা ধরে রাখব। সেই চিন্তা থেকেই সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করি। দীর্ঘ সময় ধরে নেওয়া

সাক্ষাৎকারগুলো আমাকেও স্মৃতিকাতর করে তুলছে, কারণ বাংলা কবিতার এই কীর্তিমানদের মধ্যে আবুবকর সিদ্দিক, হেলাল হাফিজ, কামাল চৌধুরী ও সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ছাড়া বাকিরা অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। এক্ষেত্রে বলি, শামসুর রাহমান ও শহীদ কাদরীর শেষ সাক্ষাৎকারটি আমি গ্রহণ করেছি। নির্মলেন্দু গুণ ও সিকদার আমিনুল হকের একমাত্র দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি আমি গ্রহণ করেছি, বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে। সুতরাং আমি মনে করি, এই বারোজন কবির সাক্ষাৎকার আপনাদের পড়ার খোরাক জোগাবে।

বইটি প্রকাশ করার জন্য কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কবি সজল আহমেদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিহাব শাহরিয়ার
ঢাকা

সাক্ষাৎকারক্রম

শামসুর রাহমান ১১
আল মাহমুদ ১৯
সৈয়দ শামসুল হক ২৫
আবুবকর সিদ্দিক ৩১
শহীদ কাদরী ৪৪
সিকদার আমিনুল হক ৫২
মহাদেব সাহা ৬৯
নির্মলেন্দু গুণ ৭৪
হলাল হাফিজ ৮৭
হাবীবুল্লাহ সিরাজী ৯৮
কামাল চৌধুরী ১০৪
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ১১০

‘আমার রক্তে গ্রামের প্রবাহ এবং আমার গড়ে ওঠায় শহরের ঢেউ’—শামসুর রাহমান

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দকে জীবন্ত দেখিনি কিন্তু শামসুর রাহমানকে দেখেছি কাছ থেকে, খুব কাছ থেকে। পেয়েছি তাঁর একান্ত সান্নিধ্য, স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সাহায্য, সহযোগিতা। আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অসংখ্য শিক্ষিত কর্মহীন তরুণকে, বিশেষ করে তরুণ লিখিয়েদেরকে চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে সুপারিশ করেছেন।

শামসুর রাহমান, বাংলা ভাষার সকল কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের প্রিয় রাহমান ভাই। রাহমান ভাইয়ের তল্লাবাগ ও শ্যামলীর বাসার পরিপাটি কক্ষে কতবার, কতদিন গিয়েছি, কথা বলেছি, আড্ডা দিয়েছি, লেখা আনতে গিয়েছি, তাঁর স্বকণ্ঠে কবিতা শুনেছি, তাঁর শরীরের খোঁজখবর নিয়েছি—তার হিসাব নেই। হিসাব রাখা হয়নি। এত নম্র, শান্তভাষী-জাতকবি, বন্ধুবৎসল, রোমান্টিক, প্রেমিক, সামাজিক, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী, উদারনৈতিক মানুষের দেখা আর কোনোদিন পাব না—তাতে মন ভীষণ খারাপ হয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনে রাহমান ভাই একজন অভিভাবক ছিলেন। আমার পরিবারের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আমার সহোদর অগ্রজ কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে বর পক্ষের একজন হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। আমার মিরপুরের বাসায় সস্ত্রীক তিনি এসেছেন কয়েকবার।

আমি রাহমান ভাইকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছি। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছেন—তখন গাড়িতে, বাসায়, স্টুডিওতে অনেক সময় পেয়েছি তাঁর সঙ্গে কথা বলার। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা-সন্ত্রাস, দুর্নীতি, গণতন্ত্রহীনতা, মৌলবাদী শক্তির উত্থান, নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কবিতা ও সাহিত্য তো আছেই কিন্তু একজন কবির ভেতর যে সংবেদনশীল, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অনুভূতি-চেতনা থাকা দরকার, তার পুরোটাই ছিল শামসুর রাহমানের ভেতর। দেশাত্মবোধ রাহমানের চেতনার প্রধান বেগ। কবিতায় তো বটেই, স্বশরীরেও প্রতিবাদ করেছেন স্বৈরাচার, মৌলবাদ, অপশাসন, অপসংস্কৃতি আর সামাজিক অন্ধকারের বিরুদ্ধে। এসব বিষয় নিয়ে পত্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন কলামও লিখেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। এ জন্য উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা নিজ বাসায় আক্রান্তও হয়েছেন। তাঁর সাহস ছিল তাঁরই সহযাত্রী কবি-শিল্পী-শুভানুধ্যায়ীরা।

কবিতা লিখে অসংখ্য ভক্ত ও কবিতাপ্রেমী তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রথম পর্বের জীবন আমি দেখিনি, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের জীবন দেখেছি—ব্যক্তিগত জীবনে যিনি সৎ, নির্লোভ, পরোপকারী এবং মানবদরদী ছিলেন। কবিতাই ছিল তাঁর অস্থিমজ্জা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান-জ্ঞান। একজন কবির যে গুণাবলি থাকা দরকার তার সবই ছিল। তাঁর কবিতা পড়ে পড়ে নিজেকে তৈরি করেছি কবিতা লেখায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাঁকে আধুনিক কবিতার আদর্শিক পুরুষ মনে করে কবিতার পথে এগিয়ে গেছি। আশির দশকের গোড়াতে যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন কবি শামসুর রাহমানের কবিতা ছিল পথের আলো। যাকে বলা যেতে পারে, গাড়ির হেডলাইট। কাগজে যখনই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো, হটকেকের মতো পড়ে নিতাম। যেমন একটি শব্দ তাঁর কবিতায় পেয়েছি 'কস্মিনকালেও'। এরকম অনেক শব্দ তিনি কবিতায় আমদানি করেছেন। নতুন শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প বিশেষ করে তাঁর আধুনিক কাব্যভাষা আমাকে প্রাণিত করেছে। এরপর যখন তাঁর কাছাকাছি গিয়েছি, যখন দূরত্ব কমে গেছে, তখন কাছের আপনজনের মতো তাঁকে পেয়েছি, এই পাওয়া ষাট-সত্তর-আশি-নব্বই প্রত্যেক দশকের কবিরাই পেয়েছেন।

১৯৮৭ সালে জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি হিসেবে শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিদের সামনে আবির্ভূত হলেন একজন কাণ্ডারি ও অগ্রনায়ক হয়ে। সাদা ধবধবে চুলের, ফরসা-সুশ্রী নন্দিত গড়নের শামসুর রাহমান কবিকুল ও আন্দোলনরত বাংলার গণতান্ত্রিক মানুষদের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠলেন। ছেড়ে দিলেন দৈনিক বাংলা পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদ। একাত্তরের ভয়াবহ সময়ে যে চাকরি ছাড়েননি, তা ছেড়ে দিলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় প্রতিদিন দেখতাম কবিকে। কথা বলতাম। তাঁর

সঙ্গ পেতাম। মনে পড়ে, জাতীয় কবিতা উৎসবের সেই সন্ধ্যায় স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কবিকুল শব্দে শব্দে সোচ্চার, তখন মঞ্চে আসরের সভাপতিত্ব করছেন পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি বসে বসে আঁকছিলেন সেই বিখ্যাত স্কেচ 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার কবলে' এবং তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর দর্শকসারিতে ছিলেন কবিতাপ্রেমী শেখ হাসিনা, যাঁর পাশেই ছিলেন নন্দিত কবি শামসুর রাহমান।

কবির কর্মস্থল দৈনিক বাংলায় কয়েকবার গিয়েছি। কর্মে-নিষ্ঠাবান কবি কখনো বিরক্ত বোধ করতেন না। বরং ফাঁক পেলেই নিজের কবিতা শোনাতেন। কবির সঙ্গে অনেক স্মৃতি আছে আমার। নব্বইয়ের গোড়াতে একবার ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ায় কবিতা পড়তে গিয়েছিলাম প্রগতিশীল অনেক কবি। বলার অপেক্ষা রাখে না, কবিদের সেই যাত্রার মধ্যমণি ছিলেন শামসুর রাহমান। নদী পার হয়ে, মধুমতীর তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জাতির পিতার পুণ্যভূমিতে কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে কবিতা পড়তে যাওয়া সবচেয়ে কনিষ্ঠতম কবি হিসেবে আমার সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার একটিই ছবি, সেটি টুঙ্গিপাড়ায় তুলেছিলাম। এই ছবিতে আরও আছেন ভাষাসংগ্রামী গাজিউল হক। নদী বাইগারের তীর ছুঁয়ে যাওয়া শ্যামল গ্রাম বঙ্গবন্ধুর জন্মভিটার পাশেই অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানস্থলের অনতি দূরে তোলা ছবিটি এখনও স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে।

কবি শামসুর রাহমানের 'স্মৃতিকথা' লেখার শুরুটা হয়েছিল আমার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে। আমি তখন 'পূর্ণতা' সাহিত্য পত্রিকার দায়িত্বে ছিলাম। সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী রাহমান ভাইকে অনুরোধ করলে, তিনি স্মৃতিকথা 'কালের ধুলোয় লেখা' লিখতে শুরু করলেন। আমি এই লেখার জন্য তাঁর শ্যামলীর বাসায় যেতাম। তিনি ডেকে নিয়ে দুতলায় তাঁর কক্ষে বসিয়ে রোল করা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে শুরু করতেন—'স্মৃতিকথা'। তিন কিস্তি লেখা ছাপা হবার পর আমি, কবি ফারুক মাহমুদের কারণে 'পূর্ণতা' ছেড়ে দিলে রাহমান ভাইয়ের স্মৃতিকথা লেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে কবি নাসির আহমেদের সম্পাদনায় জনকণ্ঠের সাময়িকীতে 'কালের ধুলোয় লেখা' শিরোনামের সেই স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'বৈঠা' নামে একটি লোকনন্দন বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করছি—যার প্রথম সংখ্যার বিষয় ছিল—জ্যোৎস্না। যাতে কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন জ্যোৎস্না বিষয়ক তাঁর নান্দনিক অনুভূতি।

একদিকে সোবহানবাগ, একদিকে তল্লাবাগ, একদিকে রাজারবাজার, অন্যদিকে সংসদ ভবন—এর মাঝখানে ছোট্ট তল্লাবাগ। সেই পাড়ায় শামসুর রাহমান কিছু সময় বসবাস করেছেন। সেখানে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম বড় ভাই সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের সঙ্গে। এর কয়েকদিন আগেই তিনি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছেন। তখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আমরা গিয়ে বসলাম পাশে। বেশ কিছুক্ষণ

কথা হলো তাঁর সঙ্গে। এই সময় তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা 'হাসপাতালের বেড থেকে' বেশ আলোচিত হচ্ছিল, যেটি হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে লিখেছেন। কবিতাটি প্রেমের কবিতা। একজন সুন্দরী নারী হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতেন, তাকে নিয়ে এই কবিতাটি কি না, অগ্রজ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল জিজ্ঞেস করলে ইংরেজি সাহিত্যের ফরসা-পরিপাটি মানুষটির মুখ একটু লজ্জায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আহা প্রেম ও বিরহের নিবেদন? এর কিছুদিন পরেই তিনি চলে আসেন শ্যামলীর ছায়াস্নিগ্ধ বাসায়। ছিলেন পুরান ঢাকায়, তারপর এলেন নতুন ঢাকায়। আর মেঘনাপারের পাড়াতলি গ্রামেও থেকেছেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কিছু সময়। সেই গ্রাম নিয়ে তিনি লিখেছেন—'নায়কের ছায়া' চমৎকার কবিতাটি, আমার খুবই পছন্দের একটি কবিতা। কয়েকটি চরণ এখানে দিই : '...পাড়াতলি/গ্রাম, নদী চিরে জেগে ওঠা, গাছপালা, ইদারা পুকুর হাট/বাজার নিঝুম গোরস্তান নিয়ে আছে। তাকে মেঘনার অঞ্জলি বলা যায়।' কবিতাটি এই কারণে পছন্দ যে, আমিও এরকম ব্রহ্মপুত্র নদের পারের একটি গ্রাম সাতানিপাড়ায় সতেরো বছরের জীবন কাটিয়েছি। মনে হয়েছে, কবি যেন আমার গ্রামের কথাই বলছেন।

কবি, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কবির শুভানুধ্যায়ী ছাড়া কবির শেষ জীবনের দিনগুলোতে কেউ এগিয়ে আসেননি তাঁর সাংসারিক কষ্ট দূর করতে। বিভিন্ন লেখার সম্মানির চেক নিয়ে অনেকদিন গিয়েছি তাঁর বাসায়—চেক পেয়ে খুশি হয়েছেন কিন্তু একটি চেক আনতে পারিনি বাংলাদেশ বেতার থেকে, যে চেকটি তাঁর গানের সম্মানির চেক ছিল। মনে আছে একসঙ্গে কবি শামসুর রাহমান, কবি নাসির আহমেদ ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের বেতারে প্রচারিত গানের রয়্যালিটির চেক আনতে গিয়ে আনতে পারিনি। কর্তৃপক্ষ বলেছে, গীতিকারকে আসতে হবে। কিন্তু শামসুর রাহমানের পক্ষে নিজে এসে চেক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই চেক শামসুর রাহমান কোনোদিন পাবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি তাঁকে চেকটি কোনোদিন পৌঁছাতে পারব না। প্রায় সকলেই জানেন, দৈনিক বাংলার চাকরি ছাড়বার পর প্রায় ২০ বছর কর্মহীন থেকে—শুধু লেখালেখি করে জীবন ও সংসার চালিয়েছেন কবি। লেখালেখির সম্মানিই ছিল তাঁর একমাত্র উপার্জন। যাঁকে বলি বাংলার কবিতার প্রধান স্তম্ভ, তাঁকে অর্থকষ্টে কাটাতে হয়েছে জীবন। যিনি দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আর বাংলার কবিতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর সংসার এখন চলছে কীভাবে? যিনি দিয়ে গেছেন অনেক কিন্তু পেয়েছেন...। কবি বলেছেন : 'যাবার সময় বস্তুত কারো/দোষত্রুটি আমি ধরিনি;/বৈরী ঋতুতে কোমল তাকায়/চর্যাপদের হরিণী।' যে চর্যাপদের কবিতা দিয়ে বাংলা কবিতার শুরু, সেই বাংলা কবিতায় নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি করে বিশাল অবদান রেখে গেছেন কবি শামসুর রাহমান। তাঁর লেখা গানটি আমাকে আজীবন আকুলিত করবে, সেই যে : 'স্মৃতি ঝলমল সুনীল মাঠের কাছে/পানি টলমল মেঘনা নদীর কাছে/আমার অনেক ঋণ আছে...'

২০০৬ সাল। জুলাই মাস। আমার অগ্রজ, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে বললাম, রাহমান ভাইয়ের একটি লিখিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিতে চাই—কী বলো? বললেন, নে। ১০০টি প্রশ্ন লিখে একদিন তাঁর ৯১১৬৩৫০ ল্যান্ডফোন নম্বরে তাঁকে ফোন করলাম, অপর প্রান্ত থেকে বললেন, চলে এসো একদিন। তারিখটা মনে নেই, তবে তখন সময়টা ছিল মধ্যদুপুর। আমার অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর বাসায়। ১/২, শ্যামলী, দুতলার নির্জন বাড়ি। নিচে থেকে কলিংবেল বাজালেই কাজের লোকটি খুলে দিল দরজা। তবে দরজায় তালা লাগানো থাকত, কারণ কিছুদিন আগে হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিরা তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল এবং এরপর থেকে বাড়িতে পুলিশ পাহারা থাকছে। পাহারারতরাও আমাকে চিনে, তাই ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি চলে গেলাম রাহমান ভাইয়ের শয়নকক্ষে। রঙিন বাটিকের লুঙ্গি আর রুচিশীল ফতোয়া পরা রাহমান ভাই বললেন, ঠিক সময়ে এসেছ, বসো। আমি পরিচ্ছন্ন বিছানায় বসলাম। দরজা জানালা খোলা, দুপুরের রোদের আলো ছিটকে পড়ছে কক্ষটিতে। সুপুরুষ কবি শামসুর রাহমানকে দরজা ভেদ করে আসা রোদে আরও মোহনীয় লাগছে। সাদা ধবধবে চুল, ফরসা চেহারার কবিকে মনে হচ্ছিল ছবিতে দেখা চল্লিশের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো। এই ৭৯ বছর বয়সেও কবি তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ঝলমল করছেন। আর তাঁর বিনয়ে মুগ্ধ হওয়ার মতো। তিনি চেয়ারে বসলেন, বললেন, শুরু করো। আমি এক এক করে প্রশ্ন করলাম, তিনি উত্তর দিতে থাকলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা। সেদিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলো। রাহমান ভাই বললেন, আজ শেষ করো। দুদিন পর আবার এসো। এরপর দুদিন গেল, ফোন করলাম, ওপাশে ফোন ধরলেন, তাঁর পুত্রবধূ টিয়া, যিনি সেবাযত্নে আগলে রেখেছেন কবিকে। তিনি বললেন, 'আব্বা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, শরীরটা বেশি খারাপ করেছে, বাসায় এলে জানাব, এরপর কবে আসবেন?' আমি কদিন পর আবার ফোন করে জানতে চাইলাম—তিনি কেমন আছেন? পুত্রবধূ জানালেন, বাসায় এসেছেন, তবে শরীরটা ভালো না। এরপর আরও কয়েকদিন ফোন করলে, জানালেন, খুবই নাজুক অবস্থায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে! খবরটা শুনে খারাপ লাগল। তারপর তাঁকে দেখতে গেলাম হাসপাতালে...সেই শেষ দেখা...আর হলো না কথা, বাকি প্রশ্নের উত্তরগুলো রয়ে গেল...অসমাপ্ত, অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত এই সাক্ষাৎকারটি নিচে পত্রস্থ করছি। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারটির পরিকল্পনায় ছিল ধারাবাহিক তাঁর জীবন ও বর্ণাঢ্যময় লেখালেখির ইতিহাস তুলে আনা। কিন্তু শেষ করতে পারিনি, বড় দুঃখই রয়ে গেল...এইটুকুই আপনারা পড়ুন।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার ডাক নাম 'বাচ্চু'। কে রেখেছিলেন এই নাম? এ নামে এখন কেউ কি ডাকে?

শামসুর রাহমান : আমার ঠিক মনে নেই—তবে যতদূর সম্ভব আমার নানি। এ নামে ডাকার মতো আত্মীয়স্বজন দু-একজন আছেন।

শিহাব শাহরিয়ার : 'রহমান' থেকে 'রাহমান' হলেন কীভাবে? এবং চৌধুরী বাদ দিলেন কেন?

শামসুর রাহমান : 'রহমান' শব্দটা আরবি বা ফারসিতে 'রাহমান' হয়, তাই আমি অরজিনাল উচ্চারণটার জন্যই রাহমান করেছি। আর চৌধুরী আমার কাছে ভালো লাগেনি, তাই গোড়া থেকেই বর্জন করেছি।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনি আপনার নানিকে 'বিষাদ সিন্ধু' পড়ে শোনাতেন? সেই বিষাদ সিন্ধু কি আপনার লেখায় কোনো ধরনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে?

শামসুর রাহমান : না, ঠিক না, আমি তখন বিষাদ সিন্ধু পড়ে শোনাতাম, বুঝতাম না, নানিও বুঝতেন বলে মনে হয় না—বিষাদ সিন্ধুকে উনি ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করতেন, তবে তা ভালো লাগত। নানি লেখাপড়া জানতেন না।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার বাবা ও মা কবে মারা যান?

শামসুর রাহমান : আমার বাবা মারা যান ১৯৬৭ সালের ২৮ এপ্রিল রাত বারোটার পর আর মা মারা যান ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার বাবা কি আপনার লেখালেখি পছন্দ করতেন?

শামসুর রাহমান : আমি যে লিখি গোড়ার দিকে আব্বা পচ্ছন্দ করতেন না, তবে আমি যখন আমার বই 'রৌদ্র করোটি'র জন্য প্রথম পুরস্কার পাই, তা শুনে উনি খুশি হন। লেখালেখি পছন্দ না করার কারণ তাঁর এক বন্ধু আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, যিনি দারিদ্র্য ও যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ জন্য আব্বা লেখালেখি পছন্দ করতেন না।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার ভাইবোনদের কথা জানতে চাই?

শামসুর রাহমান : আমার বড় ভাইয়ের বয়স এখন ৮২ বছর। তিনি অসুস্থ এবং শয্যাগত। তিনি স্ট্রোক করেছেন। তিনি এখন সামান্য কথা বলতে পারেন—তবে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। দিল-দরাজ হাসি-খুশির মানুষ। চার পুত্র ও এক কন্যার জনক তিনি। আমার ছোট ভাইটি ব্যবসায়ী ছিল, মারা গেছে। তার এক ছেলে এক মেয়ে। তার পরের ভাই ব্যারিস্টার, তিন সন্তানের পিতা—এক ছেলে, দুই মেয়ে। তার ছোট আর এক ভাই—সে ব্যবসায়ী। তিন পুত্র এক কন্যার জনক। আমার ছয় ভাইবোন সবাই জীবিত আছেন।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার ছেলেমেয়েদের কথা জানতে চাই?

শামসুর রাহমান : আমার দুই পুত্র। ছোটজন মারা গেছে—খুব অল্প বয়সে আমাদের গ্রামের বাড়ির পুকুরে ডুবে। বড় ছেলে বিবাহিত। দুই কন্যার জনক। আর আমার তিন মেয়ে—তারা বিবাহিত। বড় মেয়ের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেজ মেয়ের তিন ছেলে আর ছোট মেয়ের এক ছেলে। তিন মেয়েই বিদেশে থাকে।

শিহাব শাহরিয়ার : আপনার প্রিয় পুত্রবধূ টিয়া সম্পর্কে বলবেন?

শামসুর রাহমান : আমি এবং স্ত্রীর সৌভাগ্য টিয়ার মতো একটি মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়েছি। সে আমার নিজের মেয়ের মতোই। আমার সংসারকে